# তবুও জীবন যাচ্ছে কেটে

আমরা যারা ওয়েবে লিখালিখি করি তাদের বেশীর ভাগই প্রবাসী। মোটামুটি সব সময়ই নানা রকমের সমস্যা, তত্ব-তথ্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখা হয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তর থেকে। আজকে খুব ছোট একটা বাসন্তী শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছি সকল প্রবাসী বন্ধুদের জন্য যা হয়তো অনেককেই নিয়ে যাবে বেশ পিছনের ছাত্রজীবনে, ভোগাবে কিছুটা নস্টালজিয়াতে। আমরা প্রবাসীরা যারা দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, দুর্নীতি, দ্রব্য মুল্যের উর্ধগতি, রাজনৈতিক অবস্থা, বোমাবাজী, জেগে ওঠা মৌলবাদ, সর্বোপরি দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে মনোকষ্টে থাকি তারা এটুকু জেনে আনন্দিত হবেন যে এতো কিছুর পরও সাধারণ লোক সুস্থ জীবনের অন্বেষনে আজও ছুটে বেড়াচ্ছেন, আনন্দ করছেন, ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এর মাঝে। ব্যক্তিগত কারণে আমাকে পরপর কদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেতে হয়েছে এ সপ্তাহে, সেখানে বইমেলা, বসন্ত বরনের আয়োজন, কবিতা পাঠের উৎসব, বাংলা চলচিত্রের ৫০ বছর পুর্তির উৎসব, পিঠার উৎসব, লোকজ গানের উৎসব, ভালোবাসা দিবস (ভ্যালেন্টাইন ডে) পালনের ঘনঘটা, সর্বোপরি সেখানকার পরিবেশ আমার মনকে এতটাই নাড়া দিয়েছে যে আজ আমার সব প্রবাসী বন্ধুদেরকে ডেকে জানাতে ইচ্ছে করছে যে সব শেষ হয়ে যায়নি, ফুরিয়ে যায়নি, এখনও আছে আশার বানী।

পৌষের কুয়াশা কেটে বের হয়েছে এসেছে ঝকঝকে সোনালী রোদের সকাল। বসন্তের আগমনকে উপলক্ষ করে শীতের নিরাভরন প্রকৃতি নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে পরম আহ্লাদে। আজকাল যদিও ঢাকাতে আগের মতো এত বৃক্ষরাজির উপস্থিতি চোখে পড়ে না তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, ধানমন্ডি লেকের চারপাশে, সংসদ ভবনের সামনের অনেকটা জায়গা জুড়ে লাল কৃষ-চুরার উপস্থিতি বসন্তের আগমন বার্তা জানিয়ে দেয় লাজুক ছেলের মতো। মাঝে মাঝেই এদিক সেদিক থেকে কুহু কুহু কলরবে কোকিল তার সগৌরব উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিচ্ছে। শত যন্ত্রণা আর অস্থিরতার মাঝেও নগরবাসী মেতে উঠেছিলেন বসন্তকে বরন করার জন্য। চারুকলা, টি এস সি এমনি আরো অনেক জায়গায় ছিল বসন্ত বরন উৎসবের ঘনঘটা। পহেলা ফাল্গুনে ক্যাম্পাস এলাকায় তিল ধারণের ঠাই ছিল না, তরুন-তরুনী, কিশোর-কিশোরী ও মধ্যবয়স্ক মানুষের ভীড়ে। শিশুরাও ছিলো তাদের বাবা-মায়ের হাত ধরে এই আনন্দ উৎসবের অনেক বড় অংশীদার। অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে চারুকলা, টি এস সি, বইমেলাতে চলে এসেছিলেন বসন্তকে বরন করতে সারাদিন ব্যাপী। রাজধানী ঢাকার দুঃসহ যানজট কারো অজানা নয় আর এইদিনে ক্যাম্পাস, নীলক্ষেত, নিউমার্কেট এলাকায় কি ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভব হতে পারে ভুক্তভোগী মাত্রই কল্পনীয়। বাংলা একাডেমী তথা বইমেলা প্রান্তর ছিল উৎসবের কেন্দ্রস্থল। অকল্পনীয় ভীড় ছিল বইমেলায়, বাশীর সুর, গানের মুর্ছনা, উদাত্ত কন্ঠের আবৃত্তির উদ্দাল সুর, কবি সাহিত্যিকদের পদচারনা, চটপটি-ফুচকা, পিঠা, মুড়ালী, মোয়ায় জমজমাট পরিবেশ। মনে হচ্ছিল আকাশ, বাতাস, ধরনী এক হয়ে বাঙ্গালীর সাথে বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছিল।

তরুনী-কিশোরীদের হলুদ, কমলা, বাসন্তী শাড়ী ও ঝলমল মন কাড়া সাজের সাথে তরুন বা কিশোররাও পিছিয়ে ছিলেন না। মেরুন, হলুদ ও বাসন্তী পাঞ্জাবীতে তারাও ছিলেন নয়নাভিরাম আর হুমায়ুন আহমেদের ‘হিমু’র কারণেতো হলুদ পাঞ্জাবীতো ছেলেদের মধ্যে আজকাল বেশ জনপ্রিয়ও বটে। মনোরম শাড়ির সাথে তরুনীদের চুলে ছিল গাদা, গোলাপ, রজনীগন্ধাসহ হরেক রকম কাচা ফুলের সামঞ্জস্য। আদিকাল থেকেই যেকোন উৎসবে শাড়ীর রঙ্গের সাথে মিলিয়ে কাচের চুড়ী পড়া বাঙ্গালী তরুনীদের প্রিয় সাজের একটি। আর ক্যাম্পাসের প্রতি মোড়ে ঝুরি পেতে কাচের চুড়ীর পশরা নিয়ে বসেছিলেন খালারা। বেশীরভাগ তরুনীই কোন এক খালার পাশে বসে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, খালারা পরম যত্নে শাড়ীর রঙ্গের সাথে মিলিয়ে হাত ভর্তি চুড়ী পরিয়ে দিচ্ছিলেন তাদের। (বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চুড়ি ফেরিওয়ালীদের খালা বলে ডাকা হয় )। সুবেশী আর সুবেশদের কলরব মুখর পদচারনায় উৎসবপ্রান্তর ছিল মুখরিত। চুড়ীর তাল, হাসির শব্দ, ফুলের সুবাস আর অজস্র গান কবিতা উৎসবকে রেখেছিল জীবন্ত করে।

ধর্মীয় উৎসবের গন্ডী ছাড়িয়ে আজ নগরবাসী জাতীয় উৎসব নিয়ে যখন মেতে উঠেন তখন ভাবতে অনেক ভালো লাগে নাগিনীর কালো ছোবল সব খইয়ে দেয়নি এখনও। এখনও রয়েছে শিকড়ের প্রতি সকলের গভীর মমতা। আজ নৈতিকতার স্খলনে চারিপাশ যখন জর্জরিত, সাধারণ জনগন নিরানন্দময় নগর জীবনের যাতাকলে পিষ্ঠ, সমস্ত আনন্দ উৎসব হয়ে গেছে টাকার খেলা, ধনী লোকদের এখতিয়ার তখন সাধারন লোকদের প্রাণোজ্জল - প্রাণোচ্ছল এই আনন্দ হাসির ফোয়ারা মনকে নাড়া দেয় বৈকি। তাই সোলসের পার্থ বড়ুয়ার মতো গাইতে ইচ্ছে করে, ‘তবুও জীবন যাচ্ছে কেটে, জীবনের নিয়মে’।

তানবীরা তালুকদার
১৪ই ফেব্রুয়ারী